১৯৮৬ নির্বাচন: সংবিধান পরিবর্তন ও দীর্ঘমেয়াদী নীলনকশা

বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান। স্বাধীনতা বিরোধী এবং পাকিস্তান সরকারের প্রতি অনুগতদের মন্ত্রিসভায় স্থান দেয়া হয়। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তাকে হত্যা করা হয়। এক বছরের কম সময়ের মধ্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। অন্য সামরিক শাসনের মত এরশাদও বৈধতার সঙ্কট অতিক্রমের জন্য বেসমারিকিকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন।

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং জাতীয় পার্টির সৃষ্টি
সামরিক শাসক হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে নানাবিধ আন্দোলন সংগ্রামের সম্মুখীন হন হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। গ্রহণযোগ্যতা তৈরি ও গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সময়ক্ষেপণের লক্ষ্যে প্রথমে তিনি বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন করেন। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পৌরসভা ও মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

রাজনীতিতে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে, পূর্বসুরি সামরিক শাসকের অনুকরণে ভিতরে ভিতরে নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য কলকাঠি নাড়তে থাকেন। রাজনৈতিক দল গঠন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিচালনার অনুমতি দেন এরশাদ। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় পার্টি নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সাধারণ জনগণ, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজ অবস্থানের ম্যান্ডেট নেবার জন্য ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোটের আয়োজন করেন। এই গণভোটে সব ধরনের কারচুপি করে ৯৪.১৪ ভাগ আস্থা ভোট লাভ করেন এরশাদ।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের মুখে তিন দফা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন হয়। নির্বাচনের তারিখ প্রথমে ঘোষিত হয় ১৯৮৪ সালের ২৬ এপ্রিল। অবশেষে ১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয়

সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট, জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ ছোট-বড় ২৮টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে ৩০০ আসনের জন্য ২১৫৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৫২৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ৪৫৩ জন। নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯৭৯ জন। এ নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোটের নির্বাচন বর্জন।

সংবিধান পরিবর্তন
আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোন শক্ত প্রতিরোধ সংসদে না থাকায় এরশাদকে একপ্রকার সাহসী করে তোলে। নিজস্ব এজেন্ডা, জনগণকে প্ররোচিত করার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসাবে ধর্মীয় আড়ালে নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করে। যা তিনি পূর্বসুরি জিয়াউর রহমানের ক্ষমতাকালীন সময়ে দেখেছেন এবং শিখেছেন। জিয়া হত্যার সাজানো অভিযোগে সামরিক বাহিনীর শেষ মুক্তিযোদ্ধাপন্থী গ্রুপের ১৩ জনকে হত্যা করে নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যান এরশাদ। প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করার সময় রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় আবেগকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আনেন। যেখানে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ অটুট রাখেন এবং ‘রাষ্ট্রধর্ম’ নামে নতুন একটি অনুচ্ছেদ-২ক যুক্ত করেন।

ওই বছরই এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ‘স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি’র ১৫ জন বিশিষ্ট নাগরিকের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী উচ্চ আদালতে একটি রীট পিটিশন দাখিল করেন। রীট নাম্বার-১৪৩৪/১৯৮৮। যথেষ্ট সময় ক্ষেপণের পর এবং বাংলাদেশের যথেষ্ঠ রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালের করা রীট আবেদনের সঙ্গে ২৩ বছর পর অর্থাৎ ২০১১ সালে একটি সম্পূরক আবেদন দাখিল করা হয়। উক্ত সম্পূরক আবেদনের ওপর শুনানি শেষে ওই বছরের ৮ জুন বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ রুল জারি করেন।

১৯৮৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপি বিরোধীদলে থাকলে এতো বড় সাহস এরশাদ পেতেন না। আওয়ামী লীগ বরাবরই গণতন্ত্রপন্থী ও নির্বাচনমুখী একটি দল, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ চেয়েছিল নির্বাচনের ম্যান্ডেটের মাধ্যমে স্বৈরাশাসককে জবাব দিতে। কিন্তু কোন এক দুরভিসন্ধি থেকে অথবা জিয়া হত্যায় ১৩ জনকে ফাঁসিতে

ঝুলানোর কৃতজ্ঞতা থেকে হয়তো বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। এই কারণে উনাকে “আপোষহীন নেত্রী” উপাধি দেয় দলের লোকজন। কিন্তু এই তথাকথিত আপোষহীন নেত্রী সেদিন স্বৈরশাসককে যে ক্লিনশিট দিয়েছিল, যেভাবে গণতন্ত্রকামী এরশাদবিরোধী অন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত দলগুলোকে ছেড়ে গিয়েছিল, সেটাই বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপথ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। সেটাই ছিল ৭২’এর সংবিধানের উপর দ্বিতীয় পেরেক, যার প্রথমটি গেঁথেছিলেন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। সেই পরিবর্তনের ক্রমধারায় বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল, সংগঠন, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, মাদ্রাসাশিক্ষার নামে পাকিস্থানি, তালেবানি, আরবী সংস্কৃতি আমদানী করে আর বাংলাদেশ পিছিয়ে যেতে থাকে।

দীর্ঘমেয়াদী নীলনকশা
ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতির খেলা, যার শুরুটা করেছিলেন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। যার পূর্ণতা দিয়েছিল স্বৈরশাসক এরশাদ, তার সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী পরবর্তীতে হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। পূর্বজদের লিগ্যাসিকে সফলভাবে বাংলাদেশের সংবিধান ও জনগণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গেঁথে দিতে সফলকাম হয়েছিল বিএনপি। যার ক্রমবিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, ধর্মবাদ বিস্তৃতি লাভ করেছে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

ড. ইউনূসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নাগরিক শক্তির মৃত্যু

প্রতিবছর পৃথিবীর নানা দেশ তাদের ভালো কাজগুলোর স্বীকৃতি হিসেবে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার অপেক্ষা করে। সেইসব ভালো ও কার্যকর আবিস্কার ও সামাজিক কাজগুলোকে এগিয়ে নিতে নানা পৃষ্ঠপোষকতাও করে। এটি এক অনন্য সম্মান। সেই সম্মান বাংলাদেশের ঘরে আসার পরেও হোঁচট খেয়েছিলো।

হ্যাঁ, কথা হচ্ছিলো ড. ইউনুসকে নিয়ে। নোবেল পেয়ে তিনি নিজেকে

অব্যাহত রেখেছিল সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। অধ্যাপক ইউনূস সে পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন মাত্র। তিনি ঘোষণা দিয়েও সামাল দিতে পারেননি। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে এসে মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে না। সে পরিস্থিতিতে ডঃ ইউনুস নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের বিষয়ে একটু দ্বিধায় পড়ে যান।

অনেকের সঙ্গে দল নিয়ে আলাপ করলেও তিনি গ্রীনসিগন্যাল পাননি। ফলে ২০০৭ সালের ৩রা মে অধ্যাপক ইউনূস রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া থেকে সরে আসার ঘোষণা দেন। রাজনীতিতে আসার জন্য তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে যে খোলা চিঠি দিয়েছিলেন তার তিনমাসের মধ্যেই সে প্রক্রিয়া থেকে সরে আসেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
এবং তার সেই নাটকের জবনিকাপাত ঘটেছিলো আবারও একটি খোলা চিঠি দিয়েই। এজন্য তিনি জাতির উদ্দেশ্যে একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তিনি জাতির উদ্দেশ্যে সে চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, “যাদেরকে সঙ্গে পেলে দল গঠন করে জনগণের সামনে সবল ও উজ্জ্বল বিকল্প রাখা সম্ভব হতো তাদের আমি পাচ্ছি না। আর যারা রাজনৈতিক দলে আছেন তারা দল ছেড়ে আসবেন না। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এ পথে অগ্রসর না হওয়াই সঠিক হবে মনে করে এ প্রচেষ্টা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

এই যে রাজনৈতিক দল করার আকাঙ্ক্ষা এবং যথেষ্ট সাড়া না পেয়ে পিছিয়ে পড়া সেখানো কোথাও ড. ইউনুস নিজেকে সমালোচনা করেননি। তার মতো একজন ব্যক্তির সেটাই করার কথা ছিলো। কেনো তিনি যথেষ্ট সাড়া পেলেন না সেখানেও তিনি কখনওই নিজের কমতি দেখতে পাননি। সবসময়েই তিনি অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলেছেন। কখনও দোষ জনগনের, যারা তার উদ্দেশ্য বুঝতে অক্ষম ছিলো, কখনও দোষ মাঠের রাজনীতিবিদদের, যারা তার ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজি হননি, কখনও দোষ সময়ের, যে সময়ে ‘ফাঁকা মাঠেও’ তিনি গোল দিতে পারেননি।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন বেশি বিএনপি-জামায়াত আমলেই

“বাবারা, আমার মেয়েটা ছোট, তোমরা একজন একজন করে এসো, নইলে ও মরে যাবে।” ১৩ শব্দের বাক্যে একজন মায়ের আকুতি কী আমরা ভুলে গেছি। সন্তানের উপর কোতোটা বরবর নির্যাতন হলে একজন মা এভাবে আকুতে জানাতে পারে? কিন্তু মায়ের চোখের জল আর গগন বিদারী আহাজারীতেও নরপিশাচদের এতোটুকু মন গলেনি।

পূর্ণিমা রাণী শীলের বাড়ি সিরাজগঞ্জের উল্লাপড়ায়। ২০০১ সালে পূর্ণিমার বয়স মাত্র তেরো বছর। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সে। গ্রামের ৮-১০টি কিশোরীর মতো উচ্ছল চঞ্চল প্রাণে বেড়ে উঠছিল। কিন্তু ১৩ বছর বয়সে, ২০০১ সালের ৮ অক্টোবর তার জীবনে নেমে আসে কালো অন্ধকার। তছনছ করে দেয় তার তারুণ্যে ভরা জীবনকে। সেই রাতে পূর্ণিমার বাড়িতে হামলা চালায় বিএনপি-জামাতের নেতাকর্মীরা। এরপর পূর্ণিমা আর তার মা’কে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ির পাশের একটি ক্ষেতে। পনেরো থেকে বিশজন বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডার ধর্ষণ করে কিশোরী পূর্ণিমাকে। মায়ের সামনেই মেয়ের ছোট্ট শরীরটার ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল নরপিশাচের দল। কান্না করতে করতে পশুগুলোর কাছে মিনতি করছিলেন মা। বলছিলেন, “বাবারা, আমার মেয়েটা ছোট তোমরা একজন একজন করে এসো, নইলে ও মরে যাবে।”

ছবি রানীর বাড়ি বাগেরহাটের রামপালে। ২০০২ সালের ২১ শে আগস্ট তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট বাহিনীর নেতাকর্মীদের গণধর্ষণের শিকার হন তিনি। বাসস্ট্যন্ড থেকে ছবি রানীর কাপড় খুলে ফেলে বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডারবাহিনী। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিএনপি অফিসে। এরপর পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করা হয়। নরপিশাচরা শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, ছবি রানীর গোপন অঙ্গে মরিচের গুড়া, বালি আর কাচের গুড়া ঢুকিয়ে নির্যাতন করে।

২০০১ সালের ১৬ নভেম্বর ভোলা জেলার চরফ্যাসন উপজেলায় বিএনপি নেতাকর্মীরা ২০০ হিন্দু নারীকে গণধর্ষণ করে। সবচেয়ে ছোট ভিকটিমের বয়স ছিল 8 বছর আর সবচেয়ে বড়টির বয়স ছিল ৭০ বছর। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সারাদেশে এমন কয়েকশ’ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। চক্ষুলজ্জা আর প্রাণের ভয়ে অনেক তা প্রকাশ্যে আসেনি। তাদের সবার অপরাধ ছিল, তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং তারা

বঙ্গবন্ধুর নৌকার সমর্থক।

২০০১ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকেই সনাতন ধর্মালম্বীদের উপর হামলা শুরু হয়, যা চলে পরবর্তী পাঁচ বছর। বাগেরহাট, বরিশাল, ভোলা, বগুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, ফেনী, গাজীপুর, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, মুন্সিগঞ্জ, নাটোর, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষীরা, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ জেলায় হিন্দুদের উপর পরিকল্পিত হামলা হয়। দ্বীপ জেলা ভোলায় প্রায় দুই মাস ধরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারের উপর নির্যাতন চলে। যোগাযোগব্যবস্থা খারাপ থাকায় প্রশাসনের লোকজন এমনকি সংবাদকর্মীরাও নির্যাতনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। সেসময় সারাদেশে বাড়িঘর লুটপাট, বাড়ি থেকে উচ্ছেদের মতো অজস্র ঘটনা ঘটে। এসবের অধিকাংশই পুলিশের নথিভুক্ত হয়নি। ভুক্তভুগীরা ভয়ে কোন অভিযোগ পর্যন্ত করেননি।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব বলছে, ১৯৯৬, ২০০১ বা তার আগের প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঠিক পরের বছরে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টা বেশি। শুধু ব্যতিক্রম চিত্র দেখা যায় ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর। ১৯৯৬ এর নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২১৪টি, পরের বছরে ৫৫৪টি । ২০০১ সালে ধর্ষণের ঘটনা ৫৬৬টি হলেও পরের বছরে তা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯১টিতে। ২০১৪ সালে নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ৫৪৫টি, পরের বছরে এ সংখ্যা ছিল ৬৯০। ২০১৮ সালে নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ৫৫৬টি, পরের বছরে তা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯৭টিতে।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য ‘হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ’ নামে একটি সংগঠন হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন দায়ের করে। হাইকোর্ট এক আদেশে নির্যাতনের ঘটনা তদন্তে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ দেন। এক বছরের বেশি সময় তদন্ত শেষে ২০১১ সালের ২৪ এপ্রিল সরকারকে ৫ খণ্ডের ১ হাজার ১০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন জমা দেয় কমিশন। প্রতিবেদনে দোষীদের চিহ্নিত করা এবং নির্যাতন প্রতিরোধে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশের নির্দেশনা চেয়ে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ হাইকোর্টে আরেকটি রিট দায়ের করলে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিবেদন ২০২২ সালের ১ এপ্রিল গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

তদন্ত কমিশনের ওই প্রতিবেদনে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় ঢাকায় ২৭৬টি, চট্টগ্রামে ৪৯৭টি, সিলেটে ১৭টি, খুলনায় ৪৭৮টি, রাজশাহীতে ১৭০টি এবং বরিশালে সর্বাধিক ২ হাজার ২২৭টি ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৯২টি হত্যা, ১৮৪টি ধর্ষণ-সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনারও উল্লেখ আছে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বারবার ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কেন নিযাতনের শিকার হন? বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ। নির্বাচনের মাঠে এই ১০ ভাগ ভোটারই জয় পারাজয়ে অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে। সংখ্যালঘু ভোটারদেরকে বলা হয়, আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক। যদিও গবেষণায় দেখা যায়, সংখ্যালঘু ভোটাররা সব সময় যে একটা দলের পক্ষে ভোট দিয়েছে বা আনুগত্য প্রকাশ করেছে বিষয়টি এমন নয়। বাংলাদেশের বিভক্ত রাজনীতিতে সংখ্যালঘু ভোটারদের ভোটও বিভক্ত হয়ে পরে এবং কোন দলের প্রতি তাদের সমর্থনও প্রত্যাহার করে। সুতরাং সংখ্যালঘু ভোটার মানেই আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক এই বাস্তবতা সত্য নয়। কিন্তু বিএনপি-জামায়াতের প্রথম হামলার শিকার হন ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে আওয়ামী নেতৃত্ব মুছে ফেলা এবং যুদ্ধপরাধীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে পাকিস্থানের পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশ থেকে সনাতন ধর্বলম্বীদের সমূলে উৎখাতের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে জামায়াত-বিএনপি জোট। তাই প্রতিবার নির্বাচনে তারা হারলে বা জিতলেও সবচেয়ে বড় আক্রোশ মিটিয়েছে হিন্দুদের নির্যাতন, ধর্ষণ আর দেশ থেকে থেকে বিতাড়িত করে।

তবে এখন আর ভয় পাওয়ার সময় নেই। রুখে দিতে হবে নরপশুদের। আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজেদের দাঁড়াতে হবে। কারণ এই দেশটি সবার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আশ্বস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘নিজেদের সংখ্যালঘু মনে না করে, মনে করবেন আপনারা এই দেশেরই নাগরিক। সমান নাগরিক অধিকার আপনারা ভোগ কখনো নিজেদের মনে হীনম্মন্যতা নিয়ে আসবেন না।’

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

ওবামা, হিলারি এবং কেরি কেনেডিকে খোলা চিঠি…

প্রিয় আমেরিকান ত্রয়ী। আমি সেরকম কেউ নই। খুব সাধারণ মানুষ। ১৬০ তো বটেই আপনারা যদি ১০৬০ জন বিশিষ্ট মানুষের তালিকা করেন তার মধ্যে আমার নাম পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সম্প্রতি আপনাদের নোবেল জয়ী বন্ধু ড. ইউনূসের পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশের সরকার প্রধানকে যে বিব্রতকর খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন তার প্রতিবাদ করেছেন আমার দেশের ১৭১ জন নাগরিক। এর মধ্যেও আমার নাম নেই। তবু আমি বিব্রত। আমি কেন, যেকোন মিথ্যাচারে বহু মানুষ বিব্রত হয়। আমি আসলে তাদের প্রতিনিধি।

কোন ভুমিকায় না গিয়ে একটি বিষয় আমি সরাসরি বলতে চাই। ইউনূস সাহেবের ব্যাপারে আপনার না জেনে, না তদন্ত করে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। আজ বলে নয়। অনেক দিন ধরেই দিচ্ছেন। যেটা আপনাদের সারা জীবনের ক্যারিয়ারের সঙ্গে সাংঘার্ষিক। ভুল বুঝবেন না দয়া করে। আমি সরকারের পক্ষ নিচ্ছি না। আমি প্রথমত বিব্রত আপনাদের জন্যে। কারণ আপনাদের জানি। আপনারা যার যার ক্ষেত্রে এভারেস্ট সমান উঁচু। নিজের দেশতো বটেই সারা পৃথিবীর মানুষের কথা আপনারা ভাবছেন। কাজ করছেন। শুধু বাংলাদেশের সামনে এসে কেন বিতর্কিত হবেন?

তবু যদি বলেন এটা আপনাদের ব্যক্তিগত আচরণ। তাহলে হয়তো এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু মূল সমস্যাটা বর্তমান সময়ের। সামনে আমাদের জাতীয় নির্বাচন। এই সময়ে আপনাদের চিঠির মধ্যে লাভের আশা খুঁজছে একটি গোষ্ঠী। আর আপনাদের বন্ধু এক ঢিলে দুই পাখি মারছেন। নিজের অন্যায়ের পক্ষে জনমত গঠনও হচ্ছে, সরকারের ওপর ঝোপ বুঝে কোপ মারাও হচ্ছে। আর আপনারা এর ক্রীড়ানক হচ্ছেন। তার পরেও যদি এটাই আপনাদের ইচ্ছে হয় আপনারা আপনাদের বন্ধুর পক্ষে বলুন। কিন্তু তদন্ত করে বলুন। আমি নিশ্চিত আপনাদের বন্ধু সব কথা বলেননি। আমি আপনাদের জন্যে সেরকম কিছু না বলা কথা এই চিঠিতে হাজির করছি।

আমাদের একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ছিলো, নাম ২০০০। ওই পত্রিকায় ২০০৯ সালের মে মাসের একটি সংখ্যায় প্রকাশ হয়েছিল ‘সুফিয়ার কবর চাঁদার টাকায় / ইউনূসের হাতে নোবেল’খবরের বিষয়বস্তু, আজকের আলোচিত ইউনূস সাহেব ১৯৭৪ সালে তার ক্ষুদ্রঋণের কাজ শুরু করেছিলেন নিজের গ্রাম থেকে। প্রথম ঋণটি তিনি দিয়েছিলেন

দিয়ে মুখ বন্ধ করেন ইউনূস। দুদকের অনুসন্ধানে এসব অভিযোগেরও সত্যতা মেলে। ২০২২ সালে তাদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করে দেয়া হয়। কর ফাঁকি মামলায় দোষী হন ইউনূস। দোষী সাব্যস্ত হবার পর দিনই উনি ১২ কোটি টাকা কর দেন। কর দিয়েই তিনি প্রমাণ করেন তিনি দোষী ছিলেন।

সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য উঠে আসে তার ট্রাস্ট গঠনের আড়ালে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ অনুসন্ধানে। দেখা যায় নিজের পরিবারের ব্যয়ের টাকাও এ ট্রাস্ট থেকেই নিতেন ইউনূস। এছাড়াও নিতেন উৎসব আপ্যায়ন খরচ এবং টেলিফোন বিল। কিন্তু আইন বলে, কোন কিছু ট্রাস্ট করলে সেখান থেকে খরচ নিতে পারবেন না দাতা। কিন্তু ট্রাস্ট না করে ওই একই কাজ যদি তিনি ব্যবসা হিসাবে করেন, তাহলে পারেন। কিন্তু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর আর ট্রাস্টের কর এক নয়। কেউ সমাজসেবা করলে, তার কাছ থেকে কম কর নিয়ে উৎসাহ দিতে পারে সরকার।

মোট তিনটি ট্রাস্ট গঠন করেন ইউনূস। একটি ট্রাস্টে এমন বিধান রাখেন, যেখান থেকে তিনি নিজে এবং তার পরিবারের সদস্যরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন। অথচ ট্রাস্ট গঠনের আইনে এরধনের কোন নিয়ম নেই। এছাড়াও ইউনূসের নামে শেল কোম্পানি গঠন করে এক কোম্পানির লাভ আরেক কোম্পানিতে দান করে কর ফাঁকি দেয়ার নজির পায় দুদক। শুধু গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের জমা ৫% লভ্যাংশের হিসাবে ৩৬০০ কোটি টাকা ইউনূস অন্য কোম্পানিতে দান হিসাবে সরিয়ে দেন।

এই প্রতিটি ঘটনায় বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করেছে। আপনারা আজীবন সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষায় কথা বলেছেন । তাই নিশ্চয়ই আপনাদের বোঝানোর দরকার নেই যে, বাংলাদেশের সাংবিধানিক কোন কাজ নিয়ে কথা বলতে হলে নিশ্চয়ই তথ্য প্রমাণ নিয়ে কথা বলতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনারা কোন দায়িত্বশীলতা দেখাচ্ছেন না। আমরা জানি বেলারুশে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী এলেস বিয়ালিয়াটস্কির দশ বছরের জেল হয়েছে, আপনাদের কোন আওয়াজ পাওয়া যায়নি। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ফিলিপাইনের সাংবাদিক মারিয়া রেসা কর ফাঁকির মামলায় আদালতে ঘুরছেন। আপনাদের সেখানেও দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের সামনে নির্বাচন। এই সময় সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ নিয়েও আপনাদের উদ্বেগের শেষ নেই। নির্বাচনের আগে একটি দায়িত্বশীল সরকার আপনাদের এই দায়িত্বহীন কথার বলি হতে পারে, সে বিষয়টি কি আপনারা আমলে নেন না? এতে কী নির্বাচনী পরিবেশ সুষ্ঠু থাকছে?

আমাদের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা নিয়ে দুর্নাম নেই। অথচ আপনাদের চিঠিতে এরকম একটি বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে বলছেন। কাজটি কী ঠিক করছেন?

আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ জানে না যে আপনার দেশে ডোনেশন বলে একটা কথা বলানোর বৈধ প্রথা আছে। রাজনীতিবিদ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চ্যারিটি সংগঠন থাকে। সেখানে সেবামূলক কাজের খরচ দিলে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে বিবৃতি পাওয়া সম্ভব। ক্রেস্ট কিম্বা সাটিফিকেটও পাওয়া সম্ভব। ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে দাওয়াতেও তারা আসতে পারেন। কিন্তু সেখানে কোন কিছুই ফ্রি করার প্রথা নেই। আনারা সেই প্রথার বাইরে শুধুই বন্ধুত্ব করছেন এরকম নিশ্চয়ই নয়? করুন, শুধু অনুরোধ জেনে বুঝে করুন।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।